বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক-কবি নরেন্দ্রনাথ মিত্রর মৃত্যু হয় ১৯৭৫ সালের এই দিনে।

বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট বাঙালি কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭১ সালের এই দিনে প্রয়াত হন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মঙ্গলবার, ২৮ ভাদ্র ১৪২৮

■ ৪২ বর্ষ ■ ১১৮ সংখ্যা

তদন্তের নিরপেক্ষতা

আইন, প্রশাসনিক পদক্ষেপ ইত্যাদি আজকাল অনেক পক্ষপাতিত্বের আড়াল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রতিহিংসা, দলীয় সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি কিংবা প্রতিপক্ষকে হেনস্তা বা হেয় করার ক্ষেত্রে আইন, প্রশাসনিক পদক্ষেপ ইত্যাদি ঢাল হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশে তো বটেই, এই বাংলায় এমন উদাহরণ কম নয়। প্রতিহিংসার অভিযোগ উঠলেই তখন 'আইন আইনের পথে চলছে' জাতীয় মন্তব্যে সবকিছু সিদ্ধ করার অপচেষ্টা চলে। এর সঙ্গে 'রাজনীতির সম্পর্কে নেই' গোছের বয়ানও আকছার শোনা যায়।

সারদা, নারদ কেলেঙ্কারি তো বটেই, কয়লা পাচার মামলা রাজ্যে এখন বহুচর্চিত বিষয়। এসবে তদন্ত, বিচার ইত্যাদি ছাপিয়ে কিন্তু সেই প্রতিশোধ গ্রহণের মনোবৃত্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই মনোভাব আবার একপাক্ষিক নয়। বিভিন্ন পক্ষই নিজেদের প্রয়োজনে এমন পদক্ষেপে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থা সারদার প্রতারণায় ক্ষতিগ্রস্তদের সুবিচার পাইয়ে দেওয়ার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে কিছু নেতাকে জেলে পোরা, নিদেনপক্ষে জিজ্ঞাসাবাদের নামে হেনস্তা করার বাসনা।

যদিও দিনের পর দিন তদন্ত, জিজ্ঞাসাবাদ, কখনও বা গ্রেপ্তার আর দিনের পর দিন শুনানির বাইরে গত ৯ বছরে সারদা মামলায় প্রতারিতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজটি কার্যত চুলমাত্র এগোয়নি। সম্প্রতি সারদার চেয়েও তৎপরতার কেন্দ্রে রয়েছে নারদ মামলা। চার্জশিট পেশ হয়ে গেলেও রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার দিনকয়েক পরই তিন-তিনজন বিধায়ক ও এক প্রাক্তন মন্ত্রীর গ্রেপ্তারে তদন্তকারীদের উদ্দেশ্য আতশকাচের নীচে এসেই যায়।

পক্ষান্তরে নারদ তদন্তে এই 'গতি'র পর প্রাক্তন এক মন্ত্রীর দেহরক্ষী খুনের পুরোনো অভিযোগ খুঁচিয়ে তোলা যে নেহাত কাকতালীয় নয়, তা বুঝতে প্রাজ্ঞ মস্তিষ্কের দরকার হয় না। যদিও আদালতের নির্দেশে এখন সেই তদন্ত স্থগিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই প্রাক্তন মন্ত্রীকে নারদের স্টিং অপারেশনে তোয়ালে মুড়ে টাকা নিতে দেখা গেলেও তদন্তের আওতা থেকে সরিয়ে রাখাকে আইন আইনের পথে চলবে বলে অজুহাত দেওয়াটা নিতান্তই হাস্যকর।

একইভাবে সারদা মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত একদা রাজ্যের শাসকদলের সেকেন্ডম্যান আনুগত্য বদল করতেই সেই তদন্তের বাইরে চলে গেলেন কিংবা যে প্রাক্তন মন্ত্রী সম্প্রতি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তিনি যতদিন সর্বভারতীয় শাসকদলের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা যাপন করেছেন, ততদিন তাঁকে কার্যত ভুলে থাকাটাকেও কিন্তু তদন্তকারী সংস্থার নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। আইন আইনের পথে চলবে গোছের অজুহাত এক্ষেত্রে খুবই লঘু যুক্তি হয়ে ওঠে।

কয়লা পাচারের তদন্ত শুরু হয়েছিল রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে। সেই তদন্তকে কেন্দ্র করে ভোটের প্রচারে 'ভাইপো চোর' স্লোগান ভাইরাল হয়েছিল। কিন্তু তখন কোনও ভাইপো তদন্তকারীদের ডাক পাননি। তদন্তকারী সংস্থা রাজ্যের শাসকদলের এক শীর্ষনেতার পরিবারকে ছুঁয়ে গিয়েছে মাত্র। নারদ মামলায় নেতা-মন্ত্রীদের আটকে রাখার চেষ্টা আদালতে ধাক্কা খাওয়ার পর এখন সেই নেতাকে টানাটানির পিছনে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিহিংসার তত্ত্ব জোরালো হয়।

সারদা কেলেঙ্কারি বা নারদ মামলায় কেউ দোষী প্রমাণিত হলে নিশ্চয়ই তাঁর শাস্তি হওয়া উচিত। তেমনই কয়লা পাচারের মতো ঘৃণ্য কাজে কেউ লিপ্ত আছে বলে নিশ্চিত হলে আইনানুযায়ী তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ কাম্য। কিন্তু তদন্তের নামে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়া, হঠাৎ হঠাৎ তদন্তকারীদের তৎপরতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কিন্তু 'নিরপেক্ষ আইনি পদক্ষেপ' বাক্যবন্ধনীটির অর্থকে জোলো করে তোলে।

একইভাবে রাজ্যের যে প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এখন দেহরক্ষী খুনের তদন্ত চলছে, সেই ঘটনাটি অনেক পুরোনো। শুধু দলবদল নয়, রাজ্যে শাসকদলের সর্বোচ্চ নেত্রীকে হারানোর পর ঘটনাটি তদন্তের আওতায় এল। আইন আইনের পথে চললে এমন সময় বুঝে তৎপরতার কারণ থাকতে পারে না।

অমৃতধারা

সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা ধর্মজগতের কোনোদিনই কখনও কল্যাণ হয়নি, বরং যথেষ্ট ক্ষতি ও অপকার হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে মানুষ ধর্মের প্রকৃত আদর্শ ও লক্ষ্য ভুলে যায়। ধর্মের নামে পৃথিবীতে যত নৃশংস ব্যাপার ঘটেছে তার মূল কারণই সাম্প্রদায়িকতা। সরল সত্যপরায়ণ ও সংযমী ব্যক্তিই ধর্মলাভের অধিকারী। ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও মনকে যিনি নিজের আয়ত্তে এনেছেন, একমাত্র তিনিই ধর্মকে জানতে পারেন। কুচিন্তা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মন কিছুতেই ধর্মসাধনায় স্থির ও শান্ত হয় না। সুচিন্তা ও সংকর্মের অভ্যাসই মনঃসংযমের প্রধান উপায়। সম্পূর্ণভাবে সরল না হলে ভগবানকে লাভ করা যায় না। জিশুখ্রিস্ট সেজন্য বলেছেন,'যতক্ষণ তোমরা শিশুদের মতো সম্পূর্ণ সরল না হবে ততক্ষণ কিছুতেই ঈশ্বরকে লাভ করতে পারবে না'।

–স্বামী অভেদানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ৩০২০

পাশাপাশি : ১। নাম পরিচয় ও বাসস্থান, নাম ও ঠিকানা ৩। মহামারি, রোগাদির জন্য ক্রমাগত বহু লোকের বা প্রাণীর মৃত্যু ৫। লোকের পক্ষে কল্যাণকর ৬। কয়দিন, কতদিন, অল্প কিছুদিন ৭। একশত, বহু সংখ্যক ৯। সাধারণ লোক, কোনও দেশের বা সমাজের অধিকাংশ লোক, মূলত বিত্তহীন লোকসমষ্টি ১২। মৃত্যুর পরে পাপীদের শাস্তিভোগের কল্পিত স্থান, শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত দস্যুবিশেষ ১৩। বিরাট দেহবিশিষ্ট, প্রকাণ্ড কায়।
উপর-নীচ : ১। যশ ও প্রতিপত্তি, খ্যাতি ২। উন্নতমনা, মহৎপ্রাণ, উন্নত, উচ্চ ৩। বায়ু, উনপঞ্চাশ পবন, বাতাস ৪। পিঙ্গল বা কপিশ, পিঙ্গল বর্ণের, অঙ্গীকার, শপথ বা শর্ত ৫। মানুষ, লোক, সাধারণ মানুষ, শ্রমিক বা মজুর ৭। পাটজাতীয়, ক্ষুদ্র ও সরু গাছবিশেষ বা তার আঁশ ৮। তীব্র যন্ত্রণা, তীব্র ঠান্ডা বা শীত ৯। বুদ্ধিমান, চালাক, সমঝদার ১০। বাণ, খড়্গ ১১। বীণজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, রুদ্রবীণা।

সমাধান ■ ৩০১৯

পাশাপাশি : ১। পরচা ৪। মঞ্জিল ৫। রাকা ৭। কট্টর ৮। ললন্তিকা ৯। নজরানা ১১। তমসা ১৩। ধাপ্পা ১৪। ছাপরা ১৫। ইলেক।
উপর-নীচ : ১। পঞ্চক ২। চামর ৩। হালচাল ৬। কারিকা ৯। নবধা ১০। নাকছাবি ১১। তরাই ১২। সাগ্নিক।

শৈশবের ফুলকপি, যৌবনের ধানের স্মৃতি এবং কৃষিক্ষেত্রে তীব্র সংকট

উত্তম সেনগুপ্ত

রাঁচিতে আমার বেড়ে ওঠা। সেসময় কৃষকদের স্মৃতি এখনও আমার কাছে টাটকা। প্রতি শীতে চাষিরা খেত থেকে ফুলকপি, বাঁধাকপি তুলে বাস বা ট্রাকে নিয়ে যেতেন শহরে। প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে।

সে এক দেখার মতো দৃশ্য ছিল। বাসে স্বাভাবিকভাবেই তিলধারণের জায়গা হত না। বাসের ছাদেও ভিড়। চাষিরা করতেন কী, ঝুড়িতে ফুলকপি ভরে সব বাসের দু'ধারে ঝুলিয়ে দিতেন। সে ছিল দেখার মতো এক দৃশ্য। তখন যদি সেই ছবি একটা তুলে রাখতাম!

বেশ কয়েক বছর পরে অবাক হলাম একটা তথ্য জানতে পেরে। ওই চাষিরা আসলে অত কষ্ট করে গিয়ে তাঁদের সব ফুলকপি ফড়েদের কাছে বিক্রি করেন। সেই ফড়েরা আবার সব ফুলকপি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে পাইকারি বাজারে বিক্রি করতেন। তবে সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল অন্য। জানতে পারলাম, ফড়েরা কৃষকদের থেকে ১৮ টাকায় ১০০টি ফুলকপি কিনে নিতেন আর কলকাতায় একটি ফুলকপি ১৫ টাকায় বিক্রি হত। এই বিশাল দামের ফারাক নাকি ৪০০ কিলোমিটার দূর থেকে ফুলকপি আনার খরচ!

উত্তেজনার বশেই একবার এক চাষিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁরা কেন সরাসরি কলকাতায় গিয়ে সবজি বিক্রি করেন না? তিনি কী বলেছিলেন, আজও মনে আছে। বলেছিলেন, একবার সেই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কলকাতায় পাইকাররা ফুলকপির নিলাম করে। সেই পদ্ধতি এতটা জটিল ও রহস্যময় যে, তিনি তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারেননি। 'পাইকাররা প্রত্যেকের চাদরের তলায় নিজেদের হাত লুকিয়ে স্রেফ আঙুলের ইশারায় নিলাম চালাত।' ব্যাপারটা একেবারেই বোধগম্য হয়নি আমার কাছেও। তবে এরপর থেকে শীতকালে আমি যখনই কলকাতা যেতাম, ফুলকপির দামের খোঁজ নিতাম। সেসময় ওই কৃষকের কথাগুলো মনে পড়ে যেত।

তারপর অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। ফুলকপি উৎপাদন বা সেগুলি অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার খরচ এখন বেশ খানিকটা বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে হয়তো একটি ফুলকপির দাম সেভাবে বাড়েনি।

ছোটবেলায় আমার মাথায় একটা প্রশ্ন প্রায়ই ঘুরপাক খেত। একটি ফুলকপির থেকে একটি চকোলেট বারের দাম অন্তত তিন থেকে চারগুণ বেশি হয়। তাহলে কৃষকরা কেন ফুলকপি বা আনারস চাষ করেন? ছাত্র হিসেবে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতাম। এখন আমি উত্তরটা জানি। চাষবাস অন্য যে কোনও সাধারণ ব্যবসার থেকে অনেক বেশি ঝুঁকির। কৃষকদের আর বেশি ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা নেই, সাধ্যও নেই।

কাগজে দেখলাম, গত সপ্তাহে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সে রাজ্যের কৃষকদের আখের চাষ ছেড়ে বিকল্প কিছু চাষের উপদেশ দিয়েছেন। মাথায় রাখতে হবে, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশজুড়ে ব্যাপকহারে আখ চাষ করা হয়। সেখানে আদিত্যনাথের এই উপদেশ বেশ অসংগতিপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে যোগ করেছেন, 'ভারতীয়দের মধ্যে ডায়াবিটিসের সমস্যা বাড়ছে। তাই আর চিনির দরকার নেই।' যোগী জমানায় আখের দাম একবারও বাড়েনি। আখ চাষ না করার উপদেশ দিয়ে তিনি যেন আখচাষিদের মনোবল ভেঙে দিলেন আরও।'

হিমাচলপ্রদেশে এই মাসে প্রচুর পরিমাণে আপেল ফলেছে। এই সুযোগে আদানি অ্যাগ্রিটেক আপেলের ক্রয়মূল্য কমিয়ে দিয়েছে। সবচেয়ে ভালো আপেলচাষিদের থেকে তারা ৭২ টাকা কেজি দরে কিনছে, যা গতবারের থেকে আট টাকা কম। আপেল উৎপাদকরা অবশ্যই এতে খুব একটা খুশি নন। তাঁদের কথায়, আদানি সবচেয়ে ভালো আপেলগুলি ২৫০ টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রি করবে। তবে এই রসালো আপেলগুলো কখনোই সাধারণ ভারতীয়দের কাছে পৌঁছোবে না। সেগুলো রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা অন্য ভিআইপিদের উপহার হিসেবে পাঠানো হবে। তারপরও যেগুলো বাকি থাকবে, সেগুলো রপ্তানি হয়ে যাবে।

> আমাদের প্রজন্ম কৃষকদের কিছু দিতে পারিনি। কৃষিক্ষেত্রের সংকট এবং ফসলের মূল্য নিয়ে যাবতীয় সমস্যা আমরা সমাধান করতে ব্যর্থ। আমরা ২০ হাজারের বেশি দিয়ে স্মার্টফোন কিনছি। অথচ খাবারের জন্য একটা টাকা বেশি দিতে রাজি নই। পেঁয়াজের দাম বাড়লে যেরকম প্রতিবাদ করি, পেট্রোলের দাম বাড়লে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না।

একই কথা অন্য ফসলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমি যখন উত্তরপ্রদেশে কর্মরত, তখন এক বন্ধু অর্থনীতিবিদ আমায় বলেছিলেন, 'পঞ্জাবে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার সংগৃহীত অধিকাংশ চালই পূর্ব ভারত থেকে যায়।' কথাটা আমি তখন বিশ্বাস করিনি। আমার বন্ধু বুঝিয়ে বলেছিল, সেই সময় পূর্ব ভারতে কৃষকরা ন্যূনতম সহায়কমূল্য পেতেন না। পঞ্জাব বা হরিয়ানায় কৃষকরা যে ন্যূনতম সহায়কমূল্য পান, তার থেকে প্রায় ৮০০-১০০০ টাকা কম দামে পূর্ব ভারত থেকে পঞ্জাবের ব্যবসায়ীরা ধান কিনতেন। কেন পূর্ব ভারতের ধান পশ্চিম ভারতে আসে, তা আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছিল।

একটা ব্যাপার মেনে নিতে কোনও অসুবিধা নেই। এটা একেবারে সত্যি বাস্তব। আমাদের প্রজন্ম কৃষকদের কিছু দিতে পারিনি। কৃষিক্ষেত্রের সংকট এবং ফসলের মূল্য নিয়ে যাবতীয় সমস্যা আমরা সমাধান করতে ব্যর্থ। আমরা ২০ হাজার বা তার বেশি টাকা দিয়ে স্মার্টফোন কিনছি। অথচ খাবারের জন্য আমরা একটা টাকা বেশি দিতে রাজি নই। পেঁয়াজের দাম বাড়লে যেরকম প্রতিবাদ আমরা করি, পেট্রোলের দাম বাড়লে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না।

আসলে খাদ্যশৃঙ্খলের একেবারে নীচের সারিতে চলে গিয়েছেন কৃষকরা। একজন গ্রাহক খাদ্যশস্য, ফল বা সবজির জন্য যে দাম দেন, তার খুব সামান্য অংশ কৃষকদের হাতে গিয়ে পৌঁছোয়।

আমার একবার আমেরিকার ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় 'ক্ষুদ্র' কৃষকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কথায় কথায় তিনি একবার জানিয়েছিলেন, তাঁর পাঁচ হাজার একর জমিতে কীটনাশক ছড়িয়ে ফিরলেন। আমি কিন্তু বেশ চমকিত হয়েছিলাম। আমার চমক আরও বাড়ল আরেকটা কথা শুনে। তিনি অত বড় জমিতে কীটনাশক ছড়িয়েছেন হেলিকপ্টারের সাহায্যে। তারপর যখন শুনলাম তাঁর একটা হেলিকপ্টার আছে, আমার মাথা আর কাজ করছিল না। ছবিটা পরে মাথায় গেঁথে গিয়েছিল।

ছোট অথচ ধনী, শক্তিশালী গোষ্ঠী- বহু বছর ধরে আমেরিকার কৃষকদের এই ছবিই আমার মনে কাজ করেছে। কিন্তু আমেরিকান কৃষকদের নিয়ে দেবব্রত পাইনের পরবর্তী সিনেমা সেই ধারণা ভেঙে দিয়েছে। এই দেবব্রতই জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত 'চিটাগং' সিনেমাটি বানিয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকেন। ভারতের কৃষক আন্দোলন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে দেবব্রত ও তাঁর সহকর্মীরা আমেরিকার নানা রাজ্য ঘুরে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আমেরিকার কৃষকরা কিন্তু ভারতীয় কৃষকদের আন্দোলনের কথা শুনেছেন। তাঁদের কাছে শোনা, আমেরিকার কৃষকরা এখন বড় বড় কোম্পানির দয়ায় রয়েছেন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশনের ফলে খাদ্যদ্রব্য সস্তা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার কুপ্রভাব পড়ছে পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও মানুষের ওপর।

দেবব্রত পাইনের সিনেমাটার নাম 'দেজা ভু'। সম্প্রতি ফেসবুক ও টুইটারে সেটির ছোট্ট ট্রেলার প্রকাশ পেয়েছে। ট্রেলার দেখে আমার চিনা-আমেরিকান পরিচালক ক্লো ঝাওয়ের অস্কারজয়ী সিনেমা 'নোম্যাডল্যান্ড'-এর কথা মনে পড়ে গিয়েছে। কাজের খোঁজে কীভাবে আমেরিকানরা এক শহর থেকে অন্য শহরে চলে যেতে এবং গাড়িতেই থাকতে বাধ্য হচ্ছেন, তাই দেখানো হয়েছিল ওই সিনেমায়।

হয়তো এটা আমাদের নিজেদেরই আরও একটু ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

(লেখক ন্যাশনাল হেরাল্ড কাগজের কনসালট্যান্ট এডিটর)

আশ্রমিক ভূমিপুত্ররাই শান্তিনিকেতনের অশান্তির কারণ

শুভম পাল

আশ্রমে ছাত্রজীবনে বিশ্বভারতীর ইংরেজি বিভাগের এক অধ্যাপককে বলতে শুনেছিলাম 'বিশ্বভারতী ছাত্রদের নয়, শিক্ষকদেরও নয়। শুধু অশিক্ষক কর্মচারীদের।'

বর্তমান উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে ঘিরে বিভিন্ন বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে পুরোনো কথাটা মনে পড়ছে।

অনেকদিন পর মাসকয়েক শান্তিনিকেতনে আছি। উপাচার্যের স্বৈরাচারী শাসন সম্পর্কে নানা কথা শুনি। দিল্লির মোদি দরবারের সুনজরে থাকতে গিয়ে তাঁর বিতর্কিত কাজ নিন্দাজনক। সম্প্রতি দুটো ঘটনা নিয়ে রাজ্যেই তোলপাড়। তিন ছাত্রছাত্রীকে লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেওয়ার ঘটনায় বিচারপতির কড়া মন্তব্য শুনেছি। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাংকিংয়ে বিশ্বভারতী ২৮ ধাপ নেমে ৯৭তম স্থানে। সব খুব খারাপ ঘটনা।

শান্তিনিকেতনে কাউকে বলতে শুনছি, বিশ্বভারতী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে। এখানেই আবার অনেকে বলছেন, ঘুঘুর বাসা ভাঙতে গিয়ে রাম-ভক্ত উপাচার্য মৌমাছির চাকে ঢিল মেরেছেন। এ সবের মাঝে ছাত্রজীবনের বিশ্বভারতীর ক্রমশ ম্রিয়মাণ জলছবি ভাবি। নিজেকে প্রশ্ন করি, বিদ্যুৎ আসার আগে গুরুদেবের আশ্রমে কি 'অল ইজ ওয়েল' ছিল?

পনেরো বছর ছাত্র হিসাবে একের পর এক অনেক উপাচার্যের উৎফুল্ল-উজ্জীবিত আগমন এবং নীরবে-নিরানন্দে প্রত্যাগমন দেখেছি। নিমাইসাধন বসু, অশীন দাশগুপ্ত, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, দিলীপ সিনহা, সুজিত বসু, রজত রায়, সুশান্ত দত্তগুপ্তদের সময়কালে একটা জিনিস দেখেছি। মুষ্টিমেয় কিছু অশিক্ষক কর্মচারী কী করে কিছু স্থানীয় নেতা বা রাজনৈতিক দলের মদতে উপাচার্যদের কাঁধে বন্দুক রেখে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করেছেন। লাভের গুড় অশিক্ষক কর্মচারী সংগঠন নামক ঘুণপোকারা খেয়েছেন। কিছু শিক্ষক, ছাত্রনেতা এবং আশ্রমিকও সেই সমুদ্রমন্থনে শামিল হয়ে নিয়েছেন অমৃতের স্বাদ।

সেই আশির দশক থেকেই স্বজনপোষণ, অ্যাডমিশন টেস্টে কারচুপি, বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রভৃতি দুর্নীতির শিকার গুরুদেবের সাধের এই আশ্রম। কিছুদিন অন্তর নেতাদের তাঁবেদার অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ী করার দাবিতে বিক্ষোভ। কথায় কথায় ধর্মঘট, ঘেরাও, ভাঙচুর, ক্লাস বাতিলের মধ্যে আশ্রমের ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। আজও যা হয়।

নোবেল পদক চুরি, দুষ্প্রাপ্য পুঁথি বা দুর্মূল্য পাণ্ডুলিপি পাচার, মন্দিরে বিয়ারের বোতল-কন্ডোম উদ্ধারের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা দেখেছে আশ্রম। তখনও আশ্রমে অনিলায়ন বা গৈরিকীকরণের রাজনীতির প্রবেশ হয়নি। বিরোধীশূন্য কংগ্রেস বা তৃণমূল রাজনীতির আখড়া ছিল। বর্তমানে 'গেল গেল' রব তোলা আশ্রমিক-শিক্ষকরা এ সব দেখেও দেখেননি।

আশ্রমিকদের মধ্যে ভূমিপুত্ররাই ক্ষমতাবান। বংশানুক্রমে বিশ্বভারতীর দেওয়া চাকরি, জমি, সুবিধে বাস্তুঘুঘুর মতো দখল করে চলেছেন। আশ্রমের প্রতি এঁদের দায়বদ্ধতা- প্রতিদিন কালোর দোকানে চায়ের কাপে বা ফি বছর পৌষমেলায় সেঁজুতি দোকানে একটি আঁতেল ঠেকে সপারিষদ বসে রবীন্দ্রচর্চা বা বিশ্বদর্শনের সমালোচনা। পৌষমেলার দুর্নীতি দেখে এঁরা ঠুলি পরে থাকেন।

এঁরাই আবার নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার লোভে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনকে কুক্ষিগত করে রেখেছেন। সেখানে দেশে-বিদেশে বসবাসকারী বহু কৃতী আশ্রমিকের অলিখিত প্রবেশ নিষেধ। কারণ তাঁরা অমুক দাদা বা তমুক দিদির পরিবারের নন। এঁরা শুধু আশ্রম থেকে নিতে ভালোবাসেন, হাতের মুঠো খুলতে তাঁদের কষ্ট হয়। এঁরা এতকাল সব অন্যায় দেখেও না দেখার ভান করতেন।

এঁরাই রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার নামে বিশ্বভারতীর বিবর্তনের পথে বাধা। অথচ বাকি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সুবিধা ভোগ করার দাবিতে অনড়। নিজ নিজ গৃহে পাঁচিল এবং লোহার গেট দিয়ে সুরক্ষিত রাখেন। কিন্তু আশ্রমে কালের নিয়মের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হলে এদের গাত্রদাহ। হা রে রে করে আদর্শের বুলি আওড়ান।

ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির দৌড়ে বিভিন্ন আশ্রমিককে আমরা নানা উপাচার্যের পারিষদ হয়ে ফায়দা নিতে দেখেছি। অনেক উপাচার্য সেই আশ্রমিকদের ফাঁদে পা দিয়েছেন। মোদির ভক্ত হয়ে রাজনীতি করলেও বিদ্যুৎবাবু এই ভূমিপুত্রদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছেন। গুড়বাতাসা খাইয়ে চড়াম চড়াম উন্নয়নের বিশ্বরূপ দর্শনকারী অশিক্ষিত কেষ্টবিষ্টুদের আশ্রমে অনুপ্রবেশকেও কিছুটা আটকেছেন। হয়তো বিজেপি ভক্তিতে। কিন্তু কাজটা তো ভালো।

অতীতে অনেক কৃতী উপাচার্যকে আমরা প্রতিবাদের আগুনে মুখ পুড়িয়ে আশ্রম ছেড়ে যেতে দেখেছি। বিদ্যুৎবাবুও একদিন চলে যাবেন। কিন্তু সেই প্রশ্নটা আজও রয়ে যাবে। বিশ্বভারতী তুমি কার?

(লেখক সাংবাদিক, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র)

আলোচিত

ফাইনালে হেরে গেলেও আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। নিউ ইয়র্কে এত ভালোবাসা পেয়ে। আর একদিক দিয়ে প্রচণ্ড স্বস্তিতে। কেননা গোল্ডেন স্ল্যাম নিয়ে মানসিক চাপের মধ্যে আর আপাতত পড়তে হবে না আমাকে।

–নোভাক জকোভিচ

আজ

अ	आ	इ
ई	उ	ऊ
ऋ	ए	ऐ
ओ	औ	अं
अः	अँ	

১৯৪৯ সালে ১৪ সেপ্টেম্বর ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে হিন্দি ভাষা ভারতের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে অনুমোদিত হয়। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় দিনটি হিন্দি দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উদযাপন করা হয় দিনটি। ১৯৫৩ সালে প্রথম এই দিনটি পালন করা হয়।

বিন্দু বিসর্গ

জিতলে ডেইলি ফোর জিবি ডেটা ফ্রি দেব। –অভি

জনমত

জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রামের কথা

সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পারলাম, ভারতে গড়ে উঠছে অ্যাস্ট্রোভিলেজ। শুনে প্রথমে দমে গেলাম এই ভেবে যে, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্র-নজরুল-বিবেকানন্দ-জগদীশচন্দ্রের দেশে জ্যোতিষ-গ্রাম? পরক্ষণে ভাবি, জ্যোতিষ-গ্রাম না হয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রামও তো হতে পারে! বিষয়টি পড়ে দেখলেই ঝামেলা মিটে যায়। কিন্তু সেদিকে না গিয়ে মনের মাঝেই শুরু হল চুলচেরা বিচারবিশ্লেষণ।

সিংহভাগ ভারতবাসী জ্যোতিষশাস্ত্রের অন্ধ সমর্থক। জ্যোতিষের চোরাবালিতে হাবুডুবু খেলেও অনুতপ্ত ক'জন? সবই নিয়তির খেলা বলে সান্ত্বনা পেতে চান তাঁরা। স্টোন ও কোষ্ঠীর ভাঁওতাবাজির শিকার ওইসব নিরীহ মানুষ। আমাদের দেশে এরকম আবহে অ্যাস্ট্রোভিলেজ বলতে জ্যোতিষ-গ্রামের কথা মনে আসাটাই স্বাভাবিক। যাই হোক প্রতিবেদনটি পড়ে নিশ্চিত হওয়া গেল যে, অ্যাস্ট্রোভিলেজ বলতে এখানে জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রামের কথাই বলা হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার কর্ণপ্রয়াগ ব্লকে পাহাড়ের কোলে সুদৃশ্য মনোরম গ্রাম বেনিতাল। এই গ্রামে তৈরি হবে জ্যোতির্বিজ্ঞানকেন্দ্রটি। এখানে থাকছে নাইট ভিশন গম্বুজ, বড় টেলিস্কোপ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক নানা মজার জিনিস। গ্রহ, নক্ষত্র ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কের গতিবিধি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত নানা ঘটনা খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ মিলবে এই গ্রামে।

গণচেতনা জাগাতে এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের অন্ধকারে ডুবে থাকা মানুষকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলো দেখাতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অ্যাস্ট্রোভিলেজ গড়ে তোলা দরকার। এর জন্য চাই ব্যাপক প্রচার। এছাড়া গণমাধ্যমে জ্যোতিষ সংক্রান্ত প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা জরুরি। জ্যোতিষ সংক্রান্ত এই মতের ঠিক বিপরীত মতটাও রয়েছে। তাই সরকার ও শিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে যে কোনও একটি মত প্রতিষ্ঠিত করা হোক। হয় জ্যোতিষশাস্ত্রের নবগ্রহের তত্ত্বটিকে রাখা হোক অথবা আট গ্রহের আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের তত্ত্বকে। পরস্পরবিরোধী দুই তত্ত্ব মানবসমাজে চালু থাকায় জনগণ বিভ্রান্তির শিকার।

মহাকাশবিজ্ঞানের পড়াশোনা হোক জ্যোতিষ নির্ভর অথবা জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্রিক। দু'নৌকায় পা দিয়ে জনগণের কী হাল হচ্ছে, তা সহজেই অনুমেয়।

পরিমল ভৌমিক
আমবাড়ি, ছোট আটিয়াবাড়ি, দিনহাটা।

ট্রেনের ভাড়ায় বৈষম্য দৃষ্টিকটু

প্রায় দু'বছর হতে চলল সব ট্রেন স্পেশাল নাম দিয়ে চলছে এবং স্পেশাল নাম দেওয়ার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামতো ভাড়া বাড়াচ্ছে। আগে রেল বাজেট ছাড়া ভাড়া বাড়ানো হত না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, একই রুটে সুপারফাস্ট ট্রেনগুলোর ভাড়া বিভিন্ন রকম নেওয়া হচ্ছে। গোয়া থেকে আগরতলা, সর্বত্র।

দার্জিলিং মেল, যা এখন নিউ জলপাইগুড়ি-শিয়ালদা স্পেশাল নামে পরিচিত, তাতে এখন স্লিপার ক্লাসের ভাড়া ৪৫৫ টাকা। কিন্তু নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদা স্পেশাল (পদাতিক)-এর ভাড়া নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শিয়ালদার মধ্যে ৩৬০ টাকা অর্থাৎ দার্জিলিং মেলের ভাড়া প্রায় ১০০ টাকা বেশি। উভয় ট্রেনই সুপারফাস্ট। একইভাবে আগরতলা-শিয়ালদা স্পেশাল অর্থাৎ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের ভাড়া গুয়াহাটি থেকে নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে ৩৫৫ টাকা। কিন্তু অবধ-অসমের ভাড়া গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে ২৫৫ টাকা মাত্র। কেন এমন বৈষম্য?

এছাড়া সব ট্রেনে ছাড় বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের এবং স্পেশাল ট্রেনে কোনও ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। সাধারণ যাত্রীদের কষ্টের কথা না ভেবে রেল কর্তৃপক্ষ ইচ্ছেমতো ভাড়া বাড়িয়ে চলেছে। স্পেশাল নাম দিয়ে ট্রেন চালানোর কারণ কী?

আশিস ঘোষ, শিলিগুড়ি।

শিল্পের সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক

পশ্চিমবঙ্গে যে সরকারি চাকরির আর নিশ্চয়তা নেই- সেকথা অকপটে স্বীকার করে নিলেন আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। তবে ব্যবসা করার জন্য বা উচ্চশিক্ষার জন্য সরকার আর্থিক সাহায্য করবে এবং সুদে-আসলে পরে তা বুঝিয়ে দিতে হবে এমন ব্যবস্থা রেখেছেন। বেসরকারি পর্যায়েও কর্মসংস্থানের বিশাল আশা ক্ষীণ। কেন-না কোনও বড় শিল্পপতিই পশ্চিমবঙ্গে শিল্পস্থাপনে আগ্রহী নন।

গত দশ বছরে বহুবার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে শিল্পপতিদের বিনা পয়সায় জমি ও বিদ্যুৎ সহজ উপায়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও কোনও বড় শিল্পপতি সাড়া দেননি। তাঁদের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পস্থাপনের সুস্থ পরিবেশ নেই। গত পাঁচ বছরের রেকর্ড অন্তত তাই বলে।

রাজ্যজুড়ে চূড়ান্ত নয়ছয়, কাটমানি, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট, মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য, সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল এবং হিংসাত্মক রাজনৈতিক জটিলতায় বিভ্রান্ত জনজীবন। মেনে নিচ্ছি, মমতার উদ্যোগে বেশ কিছু পরিকল্পনা ভালো, বিশেষ করে মহিলাদের হাতে নগদ অর্থ দেওয়া এবং সঙ্গে স্বাস্থ্যসাথী। কিন্তু সবার আগে প্রয়োজন ছিল রাজ্যের সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা। মুখ্যমন্ত্রীর সেই উদ্যোগ কোথায়?

বীরেশচন্দ্র দত্ত
পশ্চিম জিৎপুর, আলিপুরদুয়ার।